পদার্থবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং একটি অনুবর্তন চক্র

ডঃ অমিতাভ মৈত্র

ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা এর সাথে যে বহুমুখী তত্ব জড়িয়ে রয়েছে, তার মূল ভিত্তি হল পদার্থ। তা সে যে রকম পদার্থই হোক না কেন; গ্যাস, সলিড, বা লিকুইড; অথবা সুপরিবাহী বা কুপরিবাহী বা অর্ধ পরিবাহী ইত্যাদি। ঠিক একই রকম ভাবে আত্মার সাথে সম্পর্কিত (আদি-আত্মিক) সব কিছুই আধ্যাত্মিক, তা সে জার্মানির মানুষ হোক বা ভারতের, অথবা একটি জিরাফ বা কুকুর বা মশা কিংবা লেবু গাছ হোক, আত্মার সাথে সম্পর্কিত হলেই হল। এখন এই ফিজিক্স এর সাথে এই আধ্যাত্মবিদ্যার একটি সামঞ্জস্য আছে। আমরা অনেক সময়ই আধ্যাত্মবিদ্যার শেষ কথাটি বা অত্যন্ত গভীরের একটি বিষয় কে নিয়ে অনেক আলোচনা করি, অথচ কিছু সাধারণ বিষয় কে অবহেলা করি অথবা কোনও ভাবে সেগুলো এড়িয়ে চলি বা হয়েত মনে করি জীবনের ওই ভুলগুলো বা ওই বদ অভ্যেসগুলি এমনি এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এমনি এমনিই কিছু হবার নয়, আপনি যেমন যেমন ভেবে চলবেন, তেমন তেমন জগত আপনার সামনে প্রতিভাত হবে - যা মতি, সা গতির্ভবেৎ।

দেখুন কথায় কথায় আমরা নিউটনের একটি ফিজিক্স এর তত্বের কথা বলে ফেললাম। এটি গতিতত্বের তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে "every action has an equal and opposite reaction"। আপনি জগতের বিভিন্ন বিষয় কে যেভাবে যেভাবে দেখবেন, যেভাবে আপনার মনে তাদের ছায়া ফেলবেন, ঠিক একই রকম ভাবে জগতও আপনার কাছে সজ্জাবিন্যাস করবে। এখানে আপনার অ্যাকশান হল আপনি কিভাবে জগত কে গ্রহণ করছেন - আপনার দৃষ্টি, অন্যদিকে রিঅ্যাকশান হল জগত আপনার কাছে কিভাবে প্রতিভাত হচ্ছে - সৃষ্টি। তাই, আপনার আমার দেখার চোখ বদলাতে হবে। যেদিন এই দেখার চোখ বদলে যাবে, সেদিন বিভিন্ন কর্মের পিছনে যে যে কারণ আছে সেটা চোখে পরবে। শুধু তাই নয়, কিভাবে একটা কর্ম আবার অন্য কর্মের জন্য কারণ হয়ে উঠছে, এবং এইভাবে কর্ম ও কারণ কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে এই বিশ্বে ছেয়ে রয়েছে চোখে পরবে। কিন্তু চোখে তখনই পরবে, যখন আপনার চোখ ও তৈরি হবে। তাই দৃষ্টি বদলানো দরকার।

নিউটনের গতিতত্বে আরও একটি সূত্র বলছে যে বাইরের কোনও ইনফ্লুএন্স বা বল ছাড়া স্থির একটি কণা বা বস্তু স্থির থাকবে এবং চলমান বস্তু ওই একই বেগে চলতে থাকবে। এবার আমরা যদি আমাদের মনের দিকে তাকাই দেখব যে আমাদের মনও যখন কোনও কিছু ভাবতে থাকে তখন সেই মন সেই দিকেই আকাশ কুসুম ভেবে প্রাসাদ তৈরি করে ফেলে। কারুর উপর কোনও কারণে ধরুন রাগ হল, আপনি আমি মনে মনে তাঁকে কত রকম কথা শোনালাম, প্রয়োজন মতন অন্য মানুষজন কেও আমাদের কল্পনায় সেই মানুষ টিকে কথা শোনানোর জন্যে নিয়ে আসলাম। আবার কাউকে যখন ভালবেসে ফেললাম মনে মনে সারাক্ষণই তাঁকে নিয়ে আমরা কল্পনা করে আনন্দের প্রাসাদ তৈরি করে ফেললাম, অথচ সে হয়েত জানেই না যে আমি তাঁকে কত ভালবাসি। কিন্তু এই ভাবনায় আবার ছেদ পরতে পারে, যদি হটাৎ করে ধরুন কেউ কোনও কারণে আপনাকে ডাকল, বা ধরুন বাইরের কোনও শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি, মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইনফ্লুএন্সের জন্যে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইনফ্লুএন্স ছাড়াও আরও একটা ইনফ্লুএন্স হতে পারে সেটা আভ্যন্তরীণ, আপনি যখন নিজের মনে ভেবে চলেছেন, তখন হটাৎ করেই হয়েত কেউ আপনার কল্পনায় চলে আসলো, এইবার তিনি হয়েতো অন্য কোনও কারণে আপনাকে আপনার চিন্তার পথ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলে গেল, হতে পারে কোনও একটা কাজের কথা মনে পরে গেল, অথবা কোনও পুরনো ঘটনার কথা মনে পরে গেল, মানে মোট কথা আপনার যে কল্পনার প্রাসাদ বা কল্পনার কথা শোনানো চলছিল সেটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। এই অসম্পূর্ণ মনের ভাবনা গুলোই কিন্তু আবার আমার আপনার স্বপ্নে এসে ভিড় করে।

পদার্থবিদ্যার খুব গোড়ার দিকে কুলম্বের সূত্র বা মহাকর্ষীয় সূত্রে দুটি পদার্থের ভর কণা বা তড়িতাহিত আধানকণার ভিতর কিরকম বল কাজ করবে তা নির্ণয় করতে দেখানো হয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের ভরকনার বা তড়িৎ আধানের গুণফলের সমানুপাতিক ও তাদের মধ্যেকার দূরত্বের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ কিনা দূরত্ব খুব বেশী হলে তারা একে অপরকে কোনরকম আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে না, দূরত্ব যত কমিয়ে আনা হবে তাদের ভিতর আকর্ষণ বল বাড়বে, আবার দূরত্ব একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে কম হলে, মানে একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসলে তাদের ভিতর প্রচণ্ড পরিমাণ বিকর্ষণ বল কাজ করবে। এই প্রচণ্ড পরিমাণ বিকর্ষণ বলটিকেই আবার নিউক্লিয়ার ফিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ শক্তি পেতে কাজে লাগানো হয়। এখন কিরকম সামঞ্জস্য দেখুন, আপনি যাকে চেনেন না, জানেন না সে আপনার বাড়ির খুব কাছেই থাকে কিন্তু মনের থেকে অনেক দুরে, তার প্রতি আপনার ভালবাসা

অভিমান রাগ কিছুই নেই – দূরত্ব বেশী। কিন্তু কোনও নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হলে তার প্রতি আপনি আকৃষ্ট হলেন। তার অনেক কথা বা আচরণ আপনাকে মুগ্ধ করলো, আপনি আকৃষ্ট হলেন, দূরত্ব কমলো। কিন্তু কিছুদিন মেলামেশার পরে আপনি আবার তার ভিতর খুঁত ধরতে শুরু করলেন, কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছেন। কারণ সে এবার আপনার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, তাই দূরত্ব কমে এসেছে বলে এবার আপনি একটা বিকর্ষণ বল অনুভব করছেন। অবশ্য কিছু কিছু মানুষ আছেন যাদের জন্য আপনি প্রথম থেকেই বিকর্ষণ বল অনুভব করেন। তাদের ভিতর সেই মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলির পরিমাণ এতটাই বেশী এবং আপনার থেকে বিপরীত ধর্মী যে আপনি শুরু থেকেই এবং দুর থেকেই অপছন্দ করবেন। আবার কিছু মানুষ আছেন যাদের জন্য আপনি বেশ উদাসীন, তারা যেটা ভাবে তার থেকে আপনি যেটা ভাবেন সেটা অনেক বেশী জোড় দিয়ে ভাবেন। আপনার ভাবনার জোড় বেশী, তাই আপনার চিন্তার ঢেউ তে তাদের চিন্তার তরঙ্গ প্রবেশ করতে পারছে না। তাই যেটা ভাববেন সেটা একটু জোড় দিয়ে ভাবতে হবে, তবেই দেখা যাবে যে অন্য ভাবনার তরঙ্গ আপনার মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। রাস্তায় চলতে গেলে অনেক আবর্জনা পাশ কাটিয়ে চলতে হয়। অবশ্য এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন আমরা নিয়মিত ধ্যান-জপ বা অনবরত গুরুর ধ্যান করতে থাকব। নিয়মিত পূজা পদ্ধতি (ধ্যান-জপ ইত্যাদি) এই জন্যেই করতে বলা হয় যে আমরা যে ধ্যান করছি, সেখান থেকে উদ্‌ভূত ধারনা টা যেন স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়, যাতে বাইরের বিপরীত ধর্মী কোনও চিন্তার তরঙ্গ ভিতরের ভাব নষ্ট করতে না পারে। সে আপনি চোদ্দ ফুট উঁচু পাঁচিল বলুন বা ঠাকুরের দই পাতা।

এবার আসা যাক পদার্থের পরিবাহিতার ধর্মে। একটি সুপরিবাহী পদার্থের (যে কোন ধাতু) ভ্যালেন্স ব্যান্ড ও কণ্ডাকশন ব্যান্ড একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকে, তাই খুব সহজে ইলেকট্রন কণ্ডাকশন ব্যান্ড এ পৌঁছে গিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। ভ্যালেন্স ব্যান্ড হল যেখানে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে আর কণ্ডাকশন ব্যান্ড হল যেখানে ইলেকট্রনগুলো পৌছতে পারে। একটি কুপরিবাহী পদার্থের (কাঠ, কাচ) ক্ষেত্রে এই দুটি ব্যান্ডের ভিতর একটা হাই এনার্জি গ্যাপ থাকে, যে এনার্জি গ্যাপ টা টপকাতে না পারার জন্যে নিচের লেভেল এর ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন উপরের লেভেল এ কণ্ডাকশন ব্যান্ড এ পৌছতে না পারার জন্যে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না। আবার অর্ধপরিবাহী (সেমিকন্ডাক্টরঃ সিলিকন, জার্মেনিয়াম) পদার্থের ক্ষেত্রে এই দুটি ব্যান্ডের ভিতর এনার্জি গ্যাপ টা খুব কম থাকে তাই অল্প শক্তি (একটু গরম করলে) বাইরে থেকে দিলেই ইলেকট্রন গুলো নিচের ভ্যালেন্স ব্যান্ড

থেকে উপরের কণ্ডাকশন ব্যান্ড এ পৌঁছে গিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। তাহলে প্রথমত দাঁড়াল সব পদার্থ পরিবহন করতে সক্ষম নয়, ঠিক যেমন সব মানুষ ঈশ্বরের নাম নিতে সক্ষম নয়। কিন্তু কুপরিবাহী পদার্থেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই জগত সংসারে, তাই যারা ঈশ্বরের নাম নিতে পারলো না তাঁরাও এই জগতে নির্দিষ্ট কারণেই থাকবে। সৃষ্টির প্রয়োজনেই তাঁরাও থাকবে। এবার পরের প্রসঙ্গে যাইঃ কিছু মানুষ আছেন যারা স্বভাবতই ঈশ্বরমুখী - সুপরিবাহী। আবার কেউ কেউ আছেন যাদের নির্দিষ্ট কারণে (বাঝ্যিক কোনও পরিবেশে) ভক্তি উদ্রেক হয় (কোনও মন্দিরে গেলে বা কীর্তন বা ধর্মপ্রসঙ্গ শুনলে), পরে আবার সেই ধর্মভাব থাকে না - অর্ধপরিবাহী। এখন এই সৃষ্টিতে সব রকম মানুষই প্রয়োজন। গুরু বলতেন "দুই নিয়া দুনিয়া"। এমনকি ঈশ্বর পূজায় দেখি ধুপও লাগে, প্রদীপও লাগে। প্রদীপ দিয়ে ধুপ ধরানো যায়, কিন্তু উল্টোটা হয় না। এখন এই এনার্জি গ্যাপটা অতিক্রম না করা পর্যন্ত কিন্তু সঠিক ভাবে আমরা গুরু-কে চিন্তায় বা বোধে পরিবহন করতে পারবও না। নিজেরই উত্তরণ এর জন্যে এই আমিত্বের দেয়াল টা অতিক্রম করতে হবে। এই অহংকারই আমাদের এনার্জি গ্যাপ, যা আমাদের তার থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাই আমরা বন্দনার শুরুতেই বলছি "পাপহং, পাপকর্মাহং..." অহং পাপ, এই অহং দ্বারা কৃত কর্মও পাপ। "যদা নাহং তদা মোক্ষ, যদাহং বন্ধনং তদা-"। যেখানে অহংকার নেই, সেটাই মোক্ষ, যেখানে অহংবোধ আছে, সেটাই বদ্ধমনের কারণ। ভ্যালেন্স ব্যান্ডে আমরা অলরেডি এই সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, কিন্তু যেখানে পৌছতে পারি, যেখানে পৌঁছনোর জন্যই বারবার এই পৃথিবীতে আসা, সেই কণ্ডাকশন ব্যান্ডে পৌছতে গেলে এই অহংভাব এই আমিত্বের দেওয়াল ভেদ করতেই হবে।

গোটা ফিজিক্স টাই মোটামুটি ক্লাসিকাল আর কোয়ান্টাম এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর তত্ব যা মোটামুটি ১৯০০ সালের পর থেকে ধরা যেতে পারে, তার আগের সব ক্লাসিকাল এর আওতায় পরে। এখন এই ক্লাসিকাল ফিজিক্স দিয়ে অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিলো না বলেই কোয়ান্টাম এর ধারনা। ক্লাসিকাল স্থূল যেখানে কোয়ান্টাম সূক্ষ্ম। কোয়ান্টাম ফিজিক্স মানে সূক্ষ্মতর ধারনা ব্যাবহারিক প্রয়োগে অনেক স্থূল ঘটনার ব্যখ্যা করতে পারে। কিন্তু উল্টোটা অসম্ভব। ঠিক যেমন স্থূল মন আর সূক্ষ্ম মন। স্থূল মনের আধার সূক্ষ্ম মন। সূক্ষ্ম মন দিয়ে আপনি সূক্ষ্ম জগতের যেমন অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবেন, যেমন সূক্ষ্ম জগতের ধারনা করতে পারবেন, ঠিক তেমনই স্থূল জগতের অনেক ঘটনাবলি কে সূক্ষ্ম মন দিয়ে কার্য-কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যখ্যা করতে পারবেন। কিন্তু স্থূল মন নিয়ে সূক্ষ্ম জগতের কোনও কিছুই ধারনা করা প্রায় অসম্ভব। এই সূক্ষ্ম মনে প্রবেশ

করার মূল চাবিকাঠিই হল ধ্যান। আরও স্পষ্ট করে বললে পাতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে দেখুন শেষ তিনটি সোপান এর কথা বলা হচ্ছে ধ্যান, ধারনা ও সমাধি। ধ্যানে মন যত গভীরে যাবে, তত মন সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হবে, ততই মন সূক্ষ্ম বস্তু বা সূক্ষ্ম ধারনা কে ধারণ করতে সক্ষম হবে। এবং যতই মন সূক্ষ্ম হবে ততই মন স্থূল কোনও চিন্তা বা ধারনা দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থির হয়ে কোনও একটি সূক্ষ্ম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অবিচলিত থাকতে পারবে।

কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর গোরার দিকের একটি পরীক্ষা হল আলোর প্রকৃতি নিয়ে। আলো আসলে কি কণাধর্মী নাকি তরঙ্গধর্মী। ইয়ং এর ডবল স্লিট পরীক্ষা। একই আলো দুই ভাগে ভাগ করে আবার একটু দুরে নিয়ে গিয়ে যখন তাদের মিলন ঘটানো হচ্ছে ততক্ষণে তারা তাদের প্রকৃতি খানিকটা পরিবর্তন করে আমাদের চোখে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তৈরি করে দিচ্ছে। এটি মূলত হবার কারণ হল দুটি আলোর রশ্মি দুটি ভিন্ন পথে গমন করে তাদের ভিতর একটি পথপার্থক্য তৈরি করে ফেলছে, যার দরুন তারা একই উৎস থেকে আসলেও তাদের ভিতর একটা প্রাকৃতিক পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন এই জগতে আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের সন্তান হলেও আপনি যে পথে চলেছেন, আর আমি যে পথে চলেছি, আপনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আমার থেকে আলাদা হবার কারণে, আপনার মতামত আর আমার মতামত সব ক্ষেত্রে একরকম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এই মতামতের অমিল ব্যপারটাই জগতে একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে, একটা বৈচিত্র্যময় জগত তৈরি করছে। তাই এই ভালমন্দ, শুচি-অশুচি র ঊর্ধ্বে গিয়ে জগতের এই প্যাটার্ন টা দেখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আরও একটা বহুল প্রচলিত তত্ব হল আপনার আমার দৃষ্টি বা অবসারভেশন কে নিয়ে। আমাদের দেখতে যাবার আগে কোনও ঘটনা হয়েত ঘটেনি, কিন্তু আমি আপনি না দেখতে পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাছে সেটা অজানা। ধরুন আমার অসুস্থ ঠাকমা'র বয়স হয়েছে, আমি অনেক দুরে থাকি বা কাছে থেকেও খুব ব্যাস্ত, খোঁজ নেওয়া হয় না, আমাকে কেউ জানাবে এইরকম সম্পর্কও নেই, সেক্ষেত্রে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে চাইছি যে উনি কেমন আছেন, আমি জানতেও পারব না যে উনি আদৌ বেঁচে আছেন না মারা গিয়েছেন। যদি মারা গিয়ে থাকেন, তবেও কিন্তু আমার খোঁজ নিতে যাবার আগে পর্যন্ত উনি আমার কাছে বেঁচেই ছিলেন খোঁজ নিতে গিয়েই জানলাম যে উনি আর বেঁচে নেই। অন্যভাবে দেখুন আপনার কাছে জগত এই ক্ষেত্রে প্রতিভাতই হয়নি, অথচ এই জগত টা আপনার কাছে প্রতিভাত হওয়া উচিত ছিল। এখানে ঠাকমার জায়গায় অন্য যে কাউকে ধরলে

ঘটনার সাময়িক আঘাত টা হয়েতো ধরতে সুবিধা হবে। কিন্তু যে জগতে আপনার থাকার কথা ছিল আপনি সেই জগতে নেই, আবার যে জগতের বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই (কাউকে দুটো কথা শুনিয়ে নিজের অপমানের জ্বালা মেটাচ্ছেন) আমরা সেই জগত মনের ভিতর কল্পনা করে সেখানেই দীর্ঘক্ষণ বাসা বাঁধি।

এবার ধরা যাক পদার্থবিদ্যার নিত্যতা সূত্র, আমরা অল্প বয়সে ফিজিক্সে শক্তির নিত্যতা সূত্র পড়েছিলাম, বড় হয়ে ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র পেয়েছি। মানে এই বিশ্বে কোনও নতুন শক্তি বা বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। শুধু তারা রূপ বদলাতে পারে। সত্যি বলতে কি এটা এতটাই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের সাথে সহমত যে ধারনার বাইরে। তিনি এক, বহু হয়েছেন। তিনি এক, তাঁকে আমরা বহু নামে ডাকি। “একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি " (ঋকবেদ-১/৬৪/৪৬)। যাগ্যবল্ক্যের কাছে যখন একজন খুব আস্ফালন করে বলতে লাগলো যে সে কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং সে কি কি নিজে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে, তখন মহর্ষি যাগ্যবল্ক্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবেন ? তিনি উত্তর দিলেন অনুরূপ দেহ অধিকারী একজন কে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। মহর্ষি বললেন না না সেরকম টা নয়, একদম নতুন করে আরও একটা এই "আপনি" তৈরি করতে পারবেন ? সাধুটি নিজের অক্ষমতা এবং জগতে সৃষ্টিসুখের মাঝে কি প্রচণ্ড পরিমাণ অসহায়তা রয়েছে সেটা, আশা করা যায়, বুঝে ওই স্থান পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

এই যে রূপ বদলে বদলে যাওয়া, সময়ের সাথে সাথে সৃষ্টির সজ্জা পরিবর্তন হওয়া। এই কারণেই এই জগত অনিত্য। "কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভ'রে, বল দেখি তুই মালী হয় সে কেমন করে ?“ কোন মালী বলবে এই কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা ? যে কার্য-কারণ কে ঘিরে এই বিশ্ব চরাচর পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গুরু জানাবেন। যেমন বাইরে থেকে জানাবেন, তেমনই ভিতর থেকেও জানাবেন।

আমরা আয়নার সামনে দাঁড়ালে, প্রতিফলনের কারণে দেখি আয়নার ঠিক যতটা দূরত্বে আমি দাঁড়িয়ে, ঠিক ততটা দূরত্বেই আমার প্রতিচ্ছবি দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমি যদি ওই আয়নার দিকে এক পা এগিয়ে যাই, প্রতিচ্ছবিও এক পা আমার দিকে (উল্টো দিক থেকে আয়নার দিকে) এগিয়ে আসে। মানে আমি এক পা আয়নার দিকে এগোলে আমার আর আমার প্রতিচ্ছবির ভিতরকার দূরত্ব মোট দুই পা কমে আসে। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মদর্শনের জন্যেও একটা আয়না আছে। যে আয়নার উপর আমরা পুরো জগতে কে দেখি। আধ্যাত্মিক জগতের এই আয়নাটা এমনিই যে এই আয়নার দিকে এক পা এগোলে, এই দূরত্ব দশ-পা কমে আসে। গুরু বারবার বলছেন

"তুমি এক-পা এগোও আমি দশ পা এগিয়ে আসবো। আমাকে আমার অন্তরের দিকে এগিয়ে যাবার তাগিদ টা শুধু রাখতে হবে। তাঁকে মন-প্রাণ ভ'রে ডাকতে হবে। বাকিটা তিনিই করে বা করিয়ে নেবেন।

স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে দেখি এবার। সময় আপনার কাছে একরকম, আমার কাছে আর একরকম। আপনার মন যত বেশী গতিশীল, আপনার কাছে সময়ের পরিমাপ তত বেশী। মন যত শান্ত, সময় তার কাছে বাঁধা। মন শান্ত হয়ে থাকলে আপনি খেয়ালই করতে পারবেন না যে ঘণ্টাখানেক বা তার বেশী আপনি এইরকম চুপ করে বসে আছেন। ঠিক এই তত্বের উপরেই ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের আবার পুরানে বলা আছে যে ব্রহ্মার এক পলক মানে আমাদের দশ হাজার বছর। স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির আরও একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হল যে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ দুটোই দুটো ফানেল এর মতন, একটা ঊর্ধ্বমুখী, আর একটা নিম্নমুখী। এবং এরা ঠিক যে বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে সেই একটি বিন্দু হল আমাদের বর্তমান। যে বর্তমান কে ঘিরে মানুষ বাঁচে বলে দাবি করে সেই বর্তমান এর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

এনার্জি ও এন্ট্রপি তাপগতিবিদ্যার মূল দুটি মূল স্তম্ভ। যেকোনো সিস্টেম যেমন তার সব থেকে কম শক্তিস্থলে অবস্থান করতে চায়, ঠিক তেমনই যে কোনও সিস্টেমের এন্ত্রপি সব সময় সব থেকে বেশী হয়ে থাকতে পছন্দ করে। এই এন্ট্রপি আবার ওই সিস্টেমে যতগুলো কণা আছে তাদের যতরকমের সজ্জাবিন্যাস সম্ভব তার উপর নির্ভর করে। সজ্জাবিন্যাসের রকমফের যত বাড়বে, এনট্রপি ও ততই বাড়বে। অর্থাৎ পৃথিবী তে যতরকমের প্রাণী থাকবে, যতরকমের মানুষ থাকবে, মানে সব মিলিয়ে সব জায়গাতে যত রকমের রকমফের থাকবে তত এই পৃথিবীর জন্যে মঙ্গল (এতে সিস্টেমের বা পৃথিবীর stability বাড়বে)। তাই প্রত্যেকের নিজস্ব মত পোষণ ও প্রকাশ করার ব্যাপারটা এই পৃথিবী মঙ্গলের জন্যেই দরকার। তাই অন্যের মতটা মন দিয়ে শুনতে হবে, সব জায়গায় নিজের মত চাপিয়ে দেবার দরকার নেই, প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতন করে বুঝবে। আবার আমরা নিজস্ব অহমিকা ছাড়তে পারলেই আমরা আমাদের সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে পৌছতে পারব। এই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে পৌঁছানো মানে কিন্তু শক্তিহীন হওয়া নয়, বরং মায়িক শক্তির প্রভাবে মন যে চঞ্চল হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় সেখান থেকে মন পরিত্রাণ পেয়ে, একমুখী হয়ে নির্দিষ্ট কারণে শক্তি অর্জন করে জগতের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যাবে।

ফ্যারাডের ইনডাকশন এফেক্ট কিন্তু আমাদের সাধন চতুষ্টয় এর অন্তর্গত সাধুসঙ্গের একটা অঙ্গ। যতক্ষণ আমরা মন্দিরে বা গির্জায় বা অন্য কোথাও কোনও সাধু মানুষের সামনাসামনি বসে অছি, তার অন্তরজ্যোতি আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হয়ে এক অনন্য শক্তির অনুক্রমণ ঘটায়, যার জন্যে আমাদের চিন্তার গতিও একমুখী হয়ে ওঠে, যেটাকে আমরা সাধারণত একটা ঘোরের মধ্যে অছি বলে বোধ করি। কিন্তু ওই সাধু সঙ্গের বাইরে আসলেই আবার ওই চিন্তার তার কেতে যায় এবং মন চঞ্চল হয়ে বহুমুখী হয়ে পরে। তাই বলছে - "সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম"।

বাটারফ্লাই এফেক্ট পরিসংখ্যান বিদ্যার এক অনবদ্য দান যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর কোথাও (নিউ ইয়র্ক) একটা প্রজাপতির পাখা নড়ানোর জন্যও বহু বহু দুরে (ক্যালিফোর্নিয়া) কোথাও প্রচণ্ড ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ যেটা আমাদের কাছে খুব ছোট্ট একটা ঘটনা হয়ে ধরা দিচ্ছে, সেটা প্রয়োজনে একটা যুগান্তকারী আলোড়ন ফেলতে পারে, যদি তিনি মনে করেন বা প্রকৃতি চাইলে একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই একটা বিশাল ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। যদি সেটারই প্রয়োজন থাকে, তবে তাই হবে। নইলে সেটা ওতি তুচ্ছ ঘটনা হয়েই রয়ে যাবে।

বিগ ব্যাং থিওরি দেখায় যে এই বিশ্ব সম্প্রসারণশীল, এবং এই সম্প্রসারের উল্টো পথে হাঁটলে পাওয়া যায় যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু সেখান থেকেই এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। পুরোটাই বৈদান্তিক ধারনার সাথে সহমত রাখে যে সেই এক হতে বহুর সৃষ্টি। কিন্তু তফাত আছে। তফাত টা এখানেই যে থিওরি বলছে শূন্য থেকেই সমস্ত সৃষ্টি আবার শূন্যতেই সমস্ত লয়। এই জায়গাতেই আধ্যাত্মিক ধারনা হল শূন্য নয়, এক হতে বহুর সৃষ্টি, একেই সব লয়। ঠাকুর বলতেন ওই শূন্যের আগে একটা এক বসাও তালেই দেখবে সব মিলবে। এই প্রসঙ্গে বলি বিগ ব্যাং থিওরি কিন্তু শুধুই এক্সট্রাপোলেশন এর উপর ভিত্তি করে। সেখানে, যেমন এই বিশ্ব কতদূর সম্প্রসারিত হয়ে আবার সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে তার কোনও নির্দিষ্ট ধারনা দেয় না, ঠিক তেমনই কতদূর সঙ্কুচিত হয়ে আবার সম্প্রসারিত হতে শুরু করবে সেই ধারনাও স্পষ্ট নয়।

পদার্থবিদ্যায় পরিসংখ্যানগত বলবিজ্ঞান বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স আছে, যেখানে একটি মূল ধারনা হল এরগোডিক হাইপথেসিস। যেখানে বলা হচ্ছে কোনও একটি সিস্টেম কে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে তার থেকে যা তথ্য পাওয়া যাবে আর ওই একই রকমের অনেকগুলি সিস্টেম কে দেখে যা ধারনা বা তথ্য পাওয়া যাবে দুটো একই হবে। এবার আমাদের কথা ধরা যাক, আমরা প্রত্যেকে সারাক্ষণ কিছু না কিছু ভেবেই চলেছি; ভালোমন্দ, পাপপুণ্য, সাদাকালো ইত্যাদি। এবার বহু মানুষের এই চিন্তাগুলো

নিয়ে যদি একটা জায়গায় রাখেন, দেখবেন আপনি বা আমি সারা জীবন ধরে সেই সমস্ত চিন্তাই কিন্তু করে এসেছি - কোনটা আগে কোনটা পরে, কিন্তু আমার আপনার চিন্তাও ওই সমস্ত মানুষের মূল চিন্তার স্রোতের সাথে একই রকম ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এর মূল কারণ হল আসলে আমি বা আপনি কখনওই আলাদা করে চিন্তা করতে পারিনা, আমাদের মনের ভিতর যে বিভিন্ন রিপুগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছে, সেগুলোর প্রভাবেই আমার আপনার উপর এই জগতের বিভিন্ন চিন্তার তরঙ্গ এসে জমা হচ্ছে। ক্বচিৎ কখনও কোনও বিশেষ পরিবেশে আমার আপনার মনের পরিস্থিতি একটু অন্যরকম (বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত) হলে তখন এই জাগতিক চিন্তার তরঙ্গের বন্ধন কে ছিঁড়ে মন পৌঁছে যায় অতীন্দ্রিয় আলোয়। তখন পরমেশ্বরের কৃপায় অতীন্দ্রিয় চিন্তার আলো ধরা পরে আমাদের মনে। আর সেটা হয় গুরুর কৃপা হলে, তাই বলে -

ন গুরোরধিকং তত্বং, ন গুরোরধিকং তপঃ।